মুক্তিযুদ্ধের কাণ্ডারী তাজউদ্দিন কন্যার অভিবাদন

শারমিন আহমেদ

প্রিয় আব্বু,
আজ তেইশে জুলাই।
আজ তোমার জন্মদিন।

তুমি যখন আমাদের মাঝে ছিলে তখন খুব সতর্কতার সাথেই আড়াল করে রাখতে তোমার পৃথিবীতে আগমনের দিনটিকে। একজন নির্মোহ সাধকের মতই নিজেকে এবং নিজের কীর্তিকে আড়াল করার অপরিসীম প্রচেষ্টার মধ্যেই তুমি চির প্রখর হয়ে রইলে। আমার মানসপটে এবং অগণিত শুভার্থী বাঙালির অন্তরাত্মায় দৈহিক গন্ডির প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে তুমি যখন উন্নীত হলে অনন্তের স্থায়ী ঠিকানায়, তখনই প্রচন্ড তাড়না বোধ করলাম তোমাকে চিঠি লেখার। মনে মনে লিখেও ফেললাম, কত শত চিঠি। তুমি চলে গেলে হঠাৎ করেই। আমার পঞ্চদশ বয়সে। এই বয়সটা বড় মারাত্মক। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলের এই বয়সটিতে শুরু হয় প্রচন্ড ভাঙ্গাগড়ার খেলা। দেহ ও মনের বৈপ্লবিক নির্মাণ কর্মে যুক্ত হয় জ্ঞান ও আবেগের বিস্ফোরিত উচ্ছ্বাস। সে সময় সন্তানের খুব বেশি প্রয়োজন হয় সঠিক দিক নির্দেশনার; প্রয়োজন হয় নির্ভরশীল, সুযোগ্য [illegible]র, ধৈর্য সহকারে মনের কথা শুনতে, বিচারকের উচ্চাসনে আসীন না হয়ে এমন এক অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের। একজন কন্যার বিশেষ করে প্রয়োজন হয় তার বাবার, যিনি হবেন অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত, যার ভাবমূর্তির আদলে কন্যা আবিষ্কার করবে সুযোগ্য মানুষকে, অনুপ্রাণিত, অনন্যজন মনের গভীরে যিনি উপস্থিত হবেন, গোটা পুরুষ জাতির প্রতিনিধি হয়ে। আমি তোমাকে হারালাম ঠিক এমনি সময়ে। অনন্ত ভালবাসায় তোমার উদ্দেশ্যে রাশি রাশি চিঠি লেখার পালার শুরু হলো তখন থেকেই।

শুরু করি, তোমার সাথে যখন আমার প্রথম দেখা, সেই দিনটির ঘটনা দিয়ে। ফাল্গুনের মিষ্টি হাওয়ার আলিঙ্গনে সূর্য উঠি উঠি করি, শাদা, রক্তজবা এক ভোরবেলায়, আমি যখন সবে ভূমিষ্ঠ হলাম পৃথিবীতে। তুমি ঘরে রয়ে রইলে আমাকে নিয়ে আতুড় ঘরে। আমার পরিচর্যা করলে, আমাকে স্নান দিলে এবং নিশ্চিত করলে পরিশ্রান্ত স্ত্রীর বিশ্রাম। ছোট্ট ঘটনা। অথচ সংস্কারের শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং পুরুষের আরাম আয়েশ ও চাহিদার প্রয়োজনে গড়ে ওঠা সে কালের (এ কালেরও) সমাজে রোপণ করলে এক বিরল দৃষ্টান্ত। আমার কাছে উদ্ভাসিত হলে আমার জীবনের দেখা প্রথম নারীবাদী পুরুষ রূপে। নারীর সুখ ও দুঃখের সাথী এবং তার মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামী প্রেরণা

তাজউদ্দিন আহমেদ।

নিঃশেষ হয়ে পড়েছিলে?

১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তুমি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সফল নেতৃত্ব দিয়েছিলে। কুষ্টিয়া জেলার আম্রকাননে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাজধানীর নামকরণ করেছিলে মুজিবনগর। লক্ষ শহীদের রক্তেই চরম প্রতিকূলতার মধ্যেও তুমি জাতিকে পৌঁছে দিয়েছিলে বিজয়ের আকাঙ্খিত স্থানে। শত্রুকুল অবস্থা, দলীয় কোন্দল, ষড়যন্ত্র, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হুমকি ও প্রচন্ড প্রতিকূলতার মধ্যেও স্বাধীনতার প্রশ্নে তুমি আপোষ করনি। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার ব্যাপারে তুমি ছিলে অবিচল। স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বলে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার পরই ভারতীয় সেনাবাহিনী, মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে বাংলাদেশে প্রবেশ করবে এবং তিন মাসের মধ্যেই ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার হবে, বাংলাদেশের ইতিহাসের এই গৌরবদীপ্ত চুক্তিটি তুমি, ইন্দিরা গান্ধী প্রশাসনের সাথে করেছিলে, প্রবাসের মাটিতে, যুদ্ধের অনিশ্চিত পরিস্থিতির মধ্যেই। নিক্সন-কিসিঞ্জার প্রশাসনকে তুমি বলেছিলে যে আমরা দরিদ্র হতে পারি কিন্তু মর্যাদাহীন নই। দেশ গড়ার জন্য, অর্থ সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তোমার ছিল সুচিন্তিত পরিকল্পনা। যারা নিজ জীবন বাজি রেখে মাতৃভূমি রক্ষায় নিজেদের উৎসর্গ করেছিল, বাংলাদেশের স্বর্ণ সন্তান সেই মুক্তিযোদ্ধা এবং পাকিস্তানি বাহিনীর পাশবিক অত্যাচারের শিকার অগণিত বীরাঙ্গনা নারীদের পুনর্বাসন, প্রশিক্ষণ ও দেশ গড়ার কাজে তাদের নিয়োজিত করার ব্যাপক পরিকল্পনাটি তুমি করেছিলে বিজয় অর্জনের পূর্বেই। দল ও দলীয় ঊর্ধ্বে তুমি অগ্রাধিকার দিয়েছিলে সততা, মেধা ও দক্ষতাকে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং ব্যক্তি স্বার্থ যাতে আইনের গতিকে রুদ্ধ না

(সেটা)

এবং সেটা চমৎকার হয়েছে পরিপুষ্ট। স্বাধীন বাংলাদেশের সুস্থ বিকাশকে রুদ্ধ করার পালা শুরু হয়েছিল তুমি এ জগতে থাকতেই। সে জন্যই তুমি বারবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছ। বাংলাদেশ পুনর্গঠনের সমস্ত পরিকল্পনা যা তুমি সাধকের অধ্যবসায় নিয়ে তিলে তিলে গড়েছিলে, তারও হয়েছিল সমাধি। তুমি মনে কষ্ট পেয়েছিলে প্রচণ্ড। ১৯৭৪ সালের ২৬ অক্টোবর তুমি মন্ত্রিসভা হতে বিদায় নিলে। বলা হলো দেশের বৃহত্তর স্বার্থে তোমাকে ইস্তফা দিতে হলো।

জাতির জনক ও তোমাদের হত্যাকান্ডের মূল ষড়যন্ত্রকারী খন্দকার মোশতাক তখন মন্ত্রিসভায় তার আসন পাকাপোক্ত করে নিয়েছে। তার দশ মাস পরই জাতির জনককে সপরিবারে হত্যা করা হলো। তোমাকে ও তোমার সহকর্মীদের নিক্ষেপ করা হলো কারাগারে। স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনার সময় তুমি পারিবারিক জীবন যাপন করোনি। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর তাড়া খেয়ে আম্মা ও ছোট তিন ভাইবোনসহ যে মাসের শেষে সীমান্ত পার হবার পরও তুমি তোমার পরিবার থেকে দূরে ছিলে। আমাদের বলেছিলে যে লাখো মুক্তিযোদ্ধারা পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যুদ্ধ করছে। তাদের নেতা হওয়ার জন্য সুযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছিলে একটি মাত্র শার্ট পরে, যা তুমি নিজেই ধুয়ে এবং শুকাতে। সেই সৎ ও সুন্দরের প্রতিনিধি, মুক্তিযুদ্ধের কান্ডারী তুমি হলে বন্দী স্বাধীন দেশের কারাগারে। কারাগারের বিষণ্ণ পরিবেশেও তুমি রচনা করলে কি অপূর্ব দৃষ্টান্ত। সেখানেও রাজবন্দীর সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তুমি নিজ হাতে কাপড় ধুতে, ঝাড়ু দিতে, বন্দীদের জন্য লাকড়ি কাটতে, রান্না করতে। মাটি কোপাতে, রোপণ করতে সারি সারি ফুলের গাছ। যদিও তুমি মনের গভীরেই সাড়া পেয়ে গিয়েছিলে যে তুমি আর বেশিদিন বাঁচবে না, তা সত্ত্বেও সৎ ও সুন্দরের জন্য সংগ্রাম তোমার থেমে থাকেনি। যেদিন তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো, তুমি আমাদেরকে বলেছিলে, 'মনে কর চিরদিনের জন্যই চলে গেলাম'। এই কথাটি পূর্বে তুমি কখনোই উচ্চারণ করনি। পাকিস্তান সরকারের কারাগারে যাবার বেলায়ও না।

তোমাকে ও তোমার তিন সহকর্মীকে হত্যার মাত্র একদিন আগেই শেষ করলে, শতাধিক ফুলের গাছ রোপণের কাজটি। তারপর চলে গেলে চিরতরে। মাত্র অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই তোমার পৃথিবীর পরিক্রমা শেষ হয়ে গেল।

মানুষ দুঃখ ও দুর্দশা থেকে মুক্তি পাবে এবং মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামী চেতনা পুরুষ হবে এবং সেটাই স্বাভাবিক। এমন ধারণাটি তোমার আচরণ হতেই পাওয়া।

তোমার কি মনে পড়ে আমার তৃতীয় জন্মদিনের কথা? সদ্য স্বাধীন দেশের মাটিতে উদযাপিত আমার তৃতীয় জন্মদিন, ২৯ ফেব্রুয়ারি মিন্টোরোডে বাসভবনে। একই সাথে আত্মিক শক্তি ও বাহ্যিক শক্তির আবর্তনে আমার পৃথিবীতে পদার্পণের চতুর্থ বার্ষিকীও এই দিনটিতে। সেই সন্ধ্যায় তুমি অফিস হতে ফিরলে যথারীতি বিলম্বে। বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব ছাড়িয়ে জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে সমর্পণ করে তুমি তখন অর্থমন্ত্রীর পদে। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও বিন্যাসে তুমি মহাব্যস্ত। ঘরে ফিরে বাড়িভরা অতিথিদের ভিড়ে আমাকে আবিষ্কার করলে। আমার পরনে শাড়ি। শাড়ি পরার তখনো বয়স হয়নি। কিন্তু বাঙালি নারীর ঐতিহ্যবাহী পোশাকটি পরার ছিল প্রচণ্ড শখ। জন্মদিনে শাড়ি পরার আমার সেই প্রথম অভিজ্ঞতা। তুমি ঈষৎ চমকে গেলে আমাকে শাড়ি পরা অবস্থায় দেখে। দেশব্যাপী গানবাজনার শখ। কিন্তু তখন আমার নিজেরই উৎসাহী হয়ে গানের আসর বসিয়েছে। তাদের গানের গাওয়া 'ওরে সালেকা, ওরে মালেকা' গানটি তখন তরুণদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়। সেটাই তখন পরিবেশিত হচ্ছিল বাজের সাথে। অতিথিদের ভিড় হতে তুমি আমাকে ডেকে নিলে নিভৃতে, তোমার শোবার ঘরের সামনে। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে নম্র স্বরে যে কথাগুলো বলে গেলে একপাটি, যে জন্যে এখনো সেই কথাগুলোই সত্যি হবে আমার জন্মদিনে, তোমার দেয়া শ্রেষ্ঠ উপহার হবে। তুমি বললে পরিস্থিতি হানাদার বাহিনীর হামলায় লাখ কোটি গৃহহারা, স্বজনহারা, নিপীড়িত মানুষের কথা। তুমি উপদেশ দিলে, চার বছরের ব্যবধানে উদযাপিত জন্মউৎসবের আনন্দ-উচ্ছ্বাসকে সংবরণ করার জন্য এবং অসমগুণ জানালে, তোমার সাথে দুর্গত এলাকাগুলো ঘুরে দেখার। যেন উচ্চারণ করতে থাকি কোন দৈবলিক বাণী, এমনি প্রভাবে আমি ফিরে গেলাম উৎসবে। তোমার কথাগুলিই বলে গেলাম নিজের মত করে। থেমে গেল বাজের বাজনা।

তাজউদ্দিন আহমেদ।

জন্মদিনের অধিকাংশ উপহারই ছিল বই। আমি বই পড়তে ভালবাসতাম এবং ঘুমটিতে তখনও বই পড়ার চর্চা অব্যাহত ছিল। আজকের স্যাটেলাইট ও ইন্টারনেটের যুগে এবং ভোগবাদের প্রকোপে কিশোরদের মাঝে বই পড়ার অভ্যাস কমে পড়েছে। তুমি পেয়েছে অস্থিরতা, অসন্তুষ্টি ও বস্তু ভোগের চাহিদা। নব্য প্রযুক্তির বন্যায় পড়ে ওরা এই যুগকে তুমি দেখনি। আমার সেই কৈশোরে, জন্মদিনের বাবে উপহার পাওয়া অনেকগুলো বইয়ের মধ্যে একটি, বিশেষ করে আমার মন কেড়ে নেয়। বইটির নাম সুকান্ত সমগ্র। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের নাম সেই প্রথম শোনা এবং তার কবিতাও প্রথম পড়া। বইয়ের ভেতরে উপহারদাতার বাণী ও স্বাক্ষর: 'রিপি, আমি বাংলাদেশে পৃথিবী দেখতে চাই, তোমাকেও তা বলতে দেখ। আ.স.ম আবদুর রব।' অপর একটি বই রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের পাতায় তিনি লিখেছিলেন 'রিপি, আজ তোমার জন্মদিন। কারো মুক্তা দিন। বড় হয়ে মনে রেখ।' সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে মুসলমানী বন্ধু ও আদর্শবাদী চেতনার সরব আত্মপ্রকাশ তখন সর্বত্রই। সুকান্তের কবিতাগুলো সে রাতেই পড়া শুরু করলাম। বাস্তবের নিপুণ রূপায়ণ হতে কল্পনাকে তার কবিতার প্রতিটি পঙক্তিতে বিদ্রোহের অনুরণন।

কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি,
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়,
পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

অথবা

বেজে উঠলো কি সময়ের ঘড়ি
এসো তবে আজ বিদ্রোহ করি
আমরা সবাই যে যার প্রহরী...' ইত্যাদি

কবিতাগুলো পড়ে এতই অনুপ্রাণিত বোধ করলাম যে সরাসরি একটি চিঠিই তাকে লিখে ফেললাম। অতিপ্রিয় জগতের অধিবাসীকে উদ্দেশ করে লেখা সেটিই আমার প্রথম চিঠি।

চিঠি লেখা শেষ হলে যখন তার ঠিকানার খোঁজে বইটিতে আবারও চোখ বুলালাম, তখন আমি বিষণ্ণ হলাম। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এই প্রতিভাবান কবি দারিদ্র্য এবং যক্ষ্মা ব্যাধির সাথে সংগ্রাম করে মাত্র একুশ বছর বয়সেই অমরত্ব লাভ করেছেন। আমি তখন কেঁদেই খুন। ঘটনাটি শুনে অনুশাসনে তুমি নিশ্চয়ই হাসছ। তোমার আবেগপ্রবণ, কল্পনাশীল কন্যাটির জীবন সত্যে জানার তখন সবেমাত্র শুরু।

অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনিসুর রহমান সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার বাংলা রেডিওতে সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে তুমি ছিলে তোমার সময়ের অনেক ঊর্ধ্বে। সে জন্যই কি তুমি ব্যক্তি স্বার্থ হতে আইনের গণ্ডিতে রুদ্ধ না করে সেই সেদিনেও ছিল তোমার সতর্ক দৃষ্টি। আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই আসতে পারে মুক্তি এবং যার অনাথায় শোষণমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক সমাজ ব্যবস্থা এবং গণতান্ত্রিক চেতনা ও সংস্কৃতির সফল বিকাশ সম্ভবপর নয়। তোমার আজীবনের এই বিশ্বাসে অনেকেই হয়েছিল ক্ষুব্ধ। তুমি ছিলে পরিমিত কথার মানুষ। কিন্তু যেটুকু বলতে তার গভীরতা ছিল ব্যাপক। ১৯৭১-এর ২২ ডিসেম্বর, দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর, স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেই সচিবালয় প্রাঙ্গণে তুমি যে বক্তব্য রেখেছিলে তা যেন এক প্রকার ভবিষ্যদ্বাণীই ছিল। তুমি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলে যে আমরা যেন এমন কোন কর্ম না করি, যার দরুণ শত শহীদের রক্তে রাঙের হাত দিয়ে সেই শক্তিক্ষয়েরই মানুষ ভাল ছিল বলবে। তুমি এ জগতের অনেক ঊর্ধ্বে চলে গেছ, তারপরও নিশ্চয়ই অপরিসীম বেদনায় দেখছ, তোমার সাধের বাংলাদেশের [illegible] বেহাল অবস্থা। চারদিকে অশনি সংকেত বাজছে। সৎ ও সুন্দর নেতৃত্বের চরম সংকট। স্বাধীনতা বিরোধী হায়েনাদের দল, যারা হত্যা করেছে আমাদের সোনার সন্তানদেরকে, ধর্মের নামে সেনাতি করেছে বিভ্রান্ত ও কলঙ্কিত, ছড়িয়ে দিয়েছে ঘৃণা ও বিদ্বেষের বিষবাষ্প, তারা আজ রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। দয়া, সহমর্মিতা, সাম্যবাদ, বিশ্বপ্রীতি ও সাম্যের প্রতিনিধিত্বকারী ইসলাম ধর্মের ধারক বাহক হয়েছে আজ সর্বত্র, সন্ত্রাসী অস্ত্র ও অস্ত্র শক্তি। যারা সন্ত্রাসবাদী শক্তি, স্বৈরাচারী, দুর্নীতিপরায়ণ চক্রান্ত ও সামরিক অস্ত্রের ছত্রছায়ায় শক্তিশালী হয়েছে তোমার পৃথিবীর পরিক্রমা শেষ হয়ে গেল।

১৯৭২ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি আমার জন্মদিনের দিন কবি সুকান্তকে চিঠি লিখেছিলাম, তার মহাপ্রয়াণের সংবাদটি না জেনেই। আর আজ তোমার জন্মদিনে চিঠি লিখলাম এই স্থির বিশ্বাসে, যে এই চিঠিটি তোমার কাছে পৌঁছবেই। বিজ্ঞান বলে শক্তির ক্ষয় নেই। তার রূপান্তর ঘটতে পারে মাত্র। সব ধর্মই বলে দেহের মৃত্যু ঘটতে পারে কিন্তু আত্মা অমর অবিনশ্বর। আর তোমার মত আদর্শবান মানুষেরা তো এই নশ্বর পৃথিবীতেই লাভ করে অমরত্ব, তাদের রেখে যাওয়া নিঃস্বার্থ কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে।

তোমার কাছে লেখা এই চিঠি লিখতে লিখতে আমি সিক্ত হয়ে গিয়েছি অশ্রুর জোয়ারে। বাবা হিসেবে তোমাকে হারাবার দুঃখের চাইতে, নেতা তাজউদ্দিন হারাবার ব্যথা অপরিসীম। তারপরও স্থির বিশ্বাস তুমি সাথেই রয়েছ। বাংলাদেশ, যাকে তুমি গভীর ভালবাসতে, তাকে তুমি ছেড়ে যাওনি। স্বাধীনতা যুদ্ধের মহান অধ্যায়, নয়টি মাস যা হয়েছে অবহেলিত ও প্রায় তলিয়ে গিয়েছে বিস্মৃতির অন্তরালে। সেই নয়টি মাসের রুদ্ধ দুয়ার খোলার প্রচেষ্টার মধ্যেই ফিরে পাওয়া যেতে পারে সুস্থ, সবল ও নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তোলার দিকনির্দেশনা-নতুন প্রজন্মের জন্য। এই আমার আশা ইংরেজিতে একটি প্রবাদ রয়েছে এ রকম [illegible]' অনন্তলোকে যাত্রার প্রাক্কালে তুমি যে শতাধিক বৃক্ষশালা রোপণ করেছিলে, তারো সেই অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আশাবাদেরই ফসলে প্রতিফলন দেখা হবে। To plant a garden is to believe in tomorrow

মেয়ের রিপি
ওয়াশিংটন।